সামাজিক,নৈতিক, রাজনৈতিক প্রায় সমস্ত বিষয় নিয়ে অমৃতলাল নাটক লিখেছেন। সামাজিক ব্যাধি—পরানুকরণ, বিধবাবিবাহ, নারীশিক্ষা, স্বদেশিয়ানার নামে হুজুগ, স্ত্রীস্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার, আধুনিকতার নামে অনৈতিকতা—এসবই ছিল অমৃতলালের আক্রমণের লক্ষ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁকে প্রাচীনতা আচ্ছন্ন করেছে বটে, কিন্তু সুস্থ ও বলিষ্ঠ জীবনাদর্শই তাঁকে উদ্‌বেজিত করেছে এসব ব্যাপারে। তাঁর নাটক-প্রহসনের গদ্য-পদ্য মেশানো ভাষা অত্যন্ত আকর্ষণীয়।[২১] শব্দচ্ছটা ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য প্রশংসনীয়, সংলাপ অত্যন্ত সরস ও উপভোগ্য। গানের ব্যবহারে তাঁর নাটকগুলি সমৃদ্ধ।

অমৃতলালের নাট্যগুলি কয়েকটি ভাগ বিন্যস্ত করে নীচে একটি তালিকা দেওয়া হল :

১. *সামাজিক নাটক—'হীরকচূর্ণ'* (১৮৭৫), *'তরুবালা'* (১৮৯১), *'খাসদখল'* (১৯২২), *'নবযৌবন'* (১৯১৪) ইত্যাদি।

২. *পৌরাণিক নাটক —'হরিশচন্দ্র'* (১৮৯৯), *'যাজ্ঞসেনী'* (১৯২৮) ইত্যাদি।

৩. *প্রহসন* (স্যাটায়ার)—*'বিবাহ বিভ্রাট'* (১৮৮৪), *'বাবু'* (১৮৯৪), *'বৌমা'* (১৮৯৭), *'গ্রাম্যবিভ্রাট'* (১৮৯৮), *'সাবাশ আটাশ'* (১৯০০) ইত্যাদি।

৪. *ফার্স বা বিশুদ্ধ প্রহসন—'চোরের উপর বাটপাড়ি'* (১৮৭৬), *'চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে'* (১৮৮৬), *'তাজ্জব ব্যাপার'* (১৮৯০), *'কৃপণের ধন'* (১৯০০), *'ব্যাপিকা বিদায়'* (১৯২৬)।

উল্লিখিত প্রহসনগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রহসন বাংলা রঙ্গমঞ্চে আজও সমাদরে অভিনীত হয়ে থাকে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, —সংক্ষেপে ডি. এল. রায় (১৮৬৩-১৯১৩) বাংলা নাট্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং ঐতিহাসিক নাট্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা। বাংলা নাট্য-জগতে তখন গিরিশ-যুগ চলছে। গিরিশ-অনুগামী অমৃতলাল ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং ভিন্ন ধারায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এমনকি রবীন্দ্রনাথ যখন সুপ্রতিষ্ঠিত অথবা প্রায়-প্রতিষ্ঠিত তখন বঙ্গরঙ্গালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট না-হয়েও নাট্যক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব।

ইউরোপীয় নাট্য-দর্শনের অভিজ্ঞতা এবং নাট্যপাঠের পূর্বপ্রস্তুতি[২২] নিয়ে পুরাণ ও ভক্তিরসের কবল থেকে মুক্ত করে, এবং ইতিহাসের গতিচঞ্চল পটভূমিকায় স্থাপন করে বাংলানাটককে নূতন আঙ্গিকে আরও অগ্রবর্তী করবার প্রয়াসী হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল, অধিকতর যোগ্যতা ও দায়িত্ব সহকারে। কবিত্ব ও নাট্যধর্মের দুই আপাতবিরোধী গুণের সমবায়ে বাংলা নাট্যক্ষেত্রে তাঁর পদক্ষেপে নাট্যজগৎ একটি নতুন দিশা খুঁজে পায়, শুধু দৃশকাব্য নয়,—পাঠ্যকাব্য হিশাবেও নাটক একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করে নেয় তাঁরই প্রণোদনায়।

ইতিপূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল 'হাসির গান' লিখে দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন, সুপরিচিতও হয়েছিলেন। এই গানের সূত্র ধরেই নাট্যজগতে তাঁর প্রবেশ হয়েছিল। তিনি নিজের কথাতেই জানিয়েছেন: 'প্রথমত, প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়া সেগুলির স্বাভাবিকতায় ও সৌন্দর্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই। ঐ সময়ে 'কল্কি অবতার' নামে একখানি প্রহসন গদ্যেপদ্যে রচনা করিয়া ছাপাই। পরে আমার পূর্বরচিত কতকগুলি হাসির গান একত্রে গাথিয়া 'বিরহ' নাটক রচনা করি।...তৎপরে উক্তরূপে 'ত্র্যহস্পর্শ' রচনা করি এবং উহাও স্টারে অভিনীত হয়। পরে 'প্রায়শ্চিত্ত রচনা করি, এবং সেখানি ক্লাসিকে অভিনীত হয়।'[২৩] প্রহসন রচনা দিয়ে নাটকরচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের হাতেখড়ি। তাঁর প্রধান প্রধান প্রহসনগুলি হল : *'কল্কি অবতার'* (১৮৯৫), *'বিরহ'* (১৮৯৭), *'ত্র্যহস্পর্শ'* (১৯০০), *'প্রায়শ্চিত্ত'* (১৯০২), *'পুনর্জন্ম'* (১৯১১) প্রভৃতি। প্রহসনগুলি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ ও খরশান। বিলেতফেরত, ব্রাহ্ম, নব্যহিন্দু, গোঁড়া ও পণ্ডিতদের প্রতি বিদ্রূপ নিক্ষিপ্ত হয়েছে *'কল্কি অবতারে'*। এই প্রহসনে সমিল পদ্যে সংলাপ রচিত হয়েছে। তথাকথিত শিক্ষিতা রোমান্সগ্রস্তা নারীদের আক্রমণ করা হয়েছে *'প্রায়শ্চিত্তে'*। *'প্রায়শ্চিত্ত'*, *'বহুৎ আচ্ছা'* নামে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রহসন *'পুনর্জন্ম'*। এতে এক কৃপণ হীনম্মন্য সুদখোরের প্রকৃত শিক্ষালাভের কাহিনী কৌতুকব্যঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। কাহিনীর জন্য নাট্যকার জনাথন সুইফ্‌ট-এর ঋণ-স্বীকার করেছেন। আর দুখানি প্রহসন *'বিরহ'* ও *'ত্র্যহস্পর্শ'*। 'বিরহ' বিশুদ্ধ প্রহসন। এর আখ্যান-বিন্যাস জটিল, সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অল্প, গানগুলি কৌতুকরসে ভরপুর। *'ত্র্যহস্পর্শ'*-এ আখ্যান-পরিকল্পনা বা হাস্যরস তেমনি জমেনি। তবে 'পারত জন্ম না কেউ বিদ্যুৎবারের বারবেলায়' এবং 'হতে পার্তেম আমি মস্ত একটা বীর'—এ-দুটি হাসির গান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। *'আনন্দ বিদায়'* (১৯১২) প্রহসনটি অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'নন্দ-বিদায়' (১৮৮৮) গীতিনাট্যের প্যারডি। নাট্যকার এই 'রঙ্গপ্রহসনে রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে রুচিবান পাঠক ও দর্শকদের দ্বারা ভর্ৎসিত হয়েছিলেন। ...ব্যক্তিগত এবং কুরুচিপূর্ণ আক্রমণের জন্য প্রহসন হিসেবে 'আনন্দবিদায়' সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।'[২৪]

দ্বিজেন্দ্রলাল তিনখানি পৌরাণিক বিষয়-অবলম্বিত নাটক রচনা করেন—*'পাষাণী'* (১৯০০), *'সীতা'* (১৯০৮), ও *'ভীষ্ম'* (১৯১৪)। এগুলি নামেই পৌরাণিক, কিন্তু স্বরূপত এগুলিতে নাট্যকারের বিশ্লেষণধর্মী আধুনিক বৈজ্ঞানিক মানসিকতাই পরিস্ফুট হয়েছে। পৌরাণিক নাটকোচিত ভক্তিরস নেই ; অলৌকিকতা, দৈবশক্তির অপ্রতিরোধ্য প্রতিষ্ঠা বা অযৌক্তিক ঘটনা নেই,—বরং অলৌকিক ঘটনার যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানাশ্রয়ী আধুনিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা আছে। মনোমোহন বসু এবং তাঁর পরে রাজকৃষ্ণ রায় পৌরাণিক নাটকে যে যাত্রাসুলভ আঙ্গিক, ভক্তিরসের মাত্রাধিকতা ও গীতের বাহুল্য আমদানি করেছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালে সে-সমস্ত বর্জিত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন নাট্যকারও নাটকে পৌরাণিক বিষয় পাশ্চাত্য নাটকের আঙ্গিকে রূপায়িত করেছিলেন।

কিন্তু পুরাণের কাহিনীর অনুবর্তন এবং ভক্তিরসের বাহুল্য বজায়ই ছিল। দ্বিজেন্দ্র নাটকে সে-সবের পরিবর্তে আধুনিক মানসিকতা, বিজ্ঞানচেতনা ও মনস্তত্ত্ববুদ্ধির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। 'পাষাণী' নাটকটিতে অভিশাপগ্রস্ত অহল্যার পাষাণত্ব-প্রাপ্তির পৌরাণিক কাহিনী পরিত্যক্ত হয়েছে, এখানে অহল্যাকে দেখানো হয়েছে কামনা-বাসিনী মর্ত্যনারীরূপে এবং ইন্দ্রকে পরস্ত্রীলুব্ধ লম্পট পুরুষ-রূপে। অহল্যার পদস্খলনে নাট্যকার মানব-মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে তৎপর হয়েছেন। 'সীতা'র কাহিনী ভবভূতির 'উত্তর-রামচরিত' এবং বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড অনুসরণে রচিত ; কিন্তু 'সীতা নাটকে সীতার চরিত্রে আধুনিক রোমান্টিক প্রকৃতিপ্রীতি, রামচরিত্রে কর্তব্যনিষ্ঠা ও প্রেম-চেতনার দ্বন্দ্ব এবং বশিষ্ঠের চরিত্রে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারের ছবি আছে। শূদ্রের অধিকারবোধ এবং ব্রাহ্মণ্য আদর্শের সঙ্গে সংঘাতের চিত্র এঁকেছেন শূদ্রক-হত্যা প্রসঙ্গে।'[২৫] নাটকটি আদ্যন্ত অন্ত্যমিলযুক্ত—পদ্যে লেখা, এর সংলাপ কাব্যময়, রাম ও সীতার সংলাপে গীতিকবিতার আবেশ অনভব করা যায়। 'ভীষ্ম ' নাটকটি মহাভারতীয় কাহিনী অনুসরণে লেখা হলেও মহাভারতের অনুসরণ নয়। 'ভীষ্ম নাটকে নায়কের কর্তব্যরক্ষা ও চিরকৌমার্যের প্রতিশ্রুতি পালনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বেধেছে সহজ হৃদয়বৃত্তির। দ্বিজেন্দ্রলাল কর্তব্য ও চিত্তবৃত্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে জীবনসত্যের খোঁজ করেছেন।'[২৬]

অবশ্য এসব নাটকে কাহিনী ও ঘটনা-বিন্যাসে শিথিলতা, কবিত্বের অতিরেক ও আবেগবাহুল্য নাট্য-সাফল্যের চূড়ান্ততা স্পর্শ করতে পারেনি। তবে পৌরাণিক চরিত্রে আধুনিক ভাব-ভাবনা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সংযোগের ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব অ-পূর্ব, প্রশংসনীয়। দ্বিজেন্দ্রলাল *'পরপারে'*[২৭] (১৯১২), *'বঙ্গনারী'* (১৯২৬) প্রভৃতি কয়েকখানি সামাজিক নাটকও লিখেছিলেন। সামাজিক নাটক হলেও এগুলি পরিবারকেন্দ্রিক। নাটক হিশাবে এগুলি উচ্চমানের হয়নি। তবে উত্তেজনাসৃষ্টিকারী ঘটনায়—খুন-জখম-ফাঁসি ইত্যাদিতে পূর্ণ বলে মঞ্চসাফল্য লাভ করেছিল।

মূলত ঐতিহাসিক নাটকগুলির জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যকার হিশাবে বাংলা নাট্য-সাহিত্যে সুবিদিত, তাঁর কৃতিত্ব ও প্রতিভার স্মারক এই নাটকগুলি। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি হল : *'তারাবাই'* (১৯০৩) *'প্রতাপসিংহ'* (১৯০৫) *'দুর্গাদাস'* (১৯০৫) , *'নূরজাহান'* (১৯০৮) 'মেবারপতন' (১৯০৮), *'চন্দ্রগুপ্ত'* (১৯১১), ও *সিংহলবিজয়'* (১৯১৫)। উল্লেখনীয় যে, 'ভীষ্ম', 'বঙ্গনারী' ও 'সিংহলবিজয়' তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে বাঙ্গালাদেশের সমসাময়িক দেশ-প্রেমোচ্ছ্বাসের চিহ্ন আছে।' 'প্রতাপসিংহ' নাটকে রাজপুতবীর প্রতাপসিংহের বীর্যবত্তা ও আত্মত্যাগের মহিমময় কাহিনী অবলম্বিত হয়েছে। 'নূরজাহান' নাটকে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে নাট্যকার কল্পনাবলে মানবী নূরজাহানের দুঃখ-বেদনা-ব্যর্থতা-দীর্ণ জীবনের কথা সুকৌশলে ব্যক্ত করেছেন। *'মেবারপতন'* নাটকে মোগল শাসকদের সঙ্গে যুদ্ধে মেবারের পরাজয়ের করুণ কাহিনী বিবৃত হয়েছে ; এই নাটকে নাট্যকার বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বমৈত্রীর মহাবাণী রূপায়িত

করতে চেষ্টা করেছেন। *'সাজাহান'* নাটকে মোগল-যুগের কুটিল ও ভয়াবহ শঠতা-ষড়যন্ত্র-রক্তপাত- ভ্রাতৃহত্যার কাহিনীর মধ্যে রুদ্ধ পঙ্গু অসহায় বন্দি সাজাহানের বেদনাময় চিত্র এবং বিপরীতপক্ষে ঔরঙ্গজেবের ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা এবং জিঘাংসাবৃত্তির ভয়ঙ্কর চিত্র নিপুণতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। *'চন্দ্রগুপ্ত'* নাটক হিন্দুযুগ অবলম্বনে লেখা হলেও দ্বিজেন্দ্রলাল অধিকাংশ ঐতিহাসিক নাটকে মোগল ও রাজপুত-যুগের ইতিহাস প্রধানভাবে অবলম্বন করেছেন। 'চন্দ্রগুপ্তে' পুরাণ এবং প্রাচীন সংস্কৃত রচনা থেকে উপাদান গৃহীত হলেও ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততা (Historical fidelity) এবং ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরা যথাসাধ্য অনুসরণ করেছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্শ্বকাহিনী ও চরিত্রে অল্পস্বল্প কালানৌচিত্য দোষ (Anachronism) ঘটলেও অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে ইতিহাসের পুরাতন যুগপ্রেক্ষিত সঠিকভাবে প্রয়োগ করেছেন, এবং সেগুলির মধ্যে আধুনিক যুগসুলভ স্বাদেশিকতাবোধ ও স্বাধীনতার জন্য আকূতিও ব্যঞ্জিত করতে সমর্থ হয়েছেন। ঐতিহাসিক নাটকগুলির উপাদান—মোগল ও রাজপুত-বিষয়ক প্লট ; যেগুলির অবলম্বন—প্রধানত টড সাহেবর Annals and Antiquities of Rajasthan গ্রন্থ। রাজপুত ও মোগল-শাসকদের সংঘাত-সংঘর্ষ এই নাটকগুলির বহির্দ্বন্দ্ব সাধন করেছে ; সেই সঙ্গে 'সাজাহান' নাটকে সাজাহান বা 'নূরজাহান' নাটকে নূরজাহান-চরিত্রের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে নাট্যকার নাটকে নাটকীয় গতি ও নাট্য-ক্রিয়ার সুযোগ কার্যকর করেছেন। 'নূরজাহান' নাটকে কাহিনী এবং নূরজাহান ব্যতীত অন্যান্য চরিত্র গ্রন্থন ও চিত্রণে নাট্যকার পুরোপুরি সফল না-হলেও এবং কাহিনী-সংগঠনে দৌর্বল্য ও নাট্য-ঘটনায় শৈথিল্য প্রদর্শন করলেও নূরজাহানের চরিত্রটি অসামান্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সাজাহানের পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তার দ্বৈতরূপ সৃষ্টিতে তিনি যে নৈপুণ্য ও মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা ইতিপূর্বে বাংলা নাটকে অভাবিত ছিল। ঔরঙ্গজেবের শঠতা ও ক্রূরবুদ্ধি, উপস্থিতবুদ্ধি, নিষ্ঠুরতা, জিঘাংসা প্রভৃতির সঙ্গে আত্ম-অনুশোচনা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব যোজনা করে প্রতি-নায়কোচিত চরিত্রটিকেও প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব নাটকের প্রধান বিষয় হলেও সাজাহানের ব্যক্তি-চরিত্রের উন্মোচন ও আত্মিক যন্ত্রণা এই নাটকের প্রধান আকর্ষণবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমালোচকেরা গঠন ও নাটকীয় রসসৃষ্টির দিক দিয়ে বিচার করে 'সাজাহান' নাটকটিকেই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিয়েছেন। যদিও অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকের মতো 'সাজাহানে'ও নাট্যকারের কবিত্বধর্ম নাট্যধর্মকে ক্ষুণ্ণ ও বিঘ্নিত করেছে, ভাবালুতা ও আবেগাতিরেক নাটকের রস ঘনীভূত হতে দেয়নি, তবু চরিত্রসৃষ্টি, ওজঃগুণসম্পন্ন সংলাপরচনা, তুলনামূলকভাবে নাটকের প্লটগঠন ও ঘটনা-সংহতির উৎকর্ষে 'সাজাহান' বাংলা নাট্যসাহিত্যের—ঐতিহাসিক নাট্য-সাহিত্যের একটি সফল সৃষ্টি হিশাবে নাট্য-সমালোচকদের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে, বিশেষত 'নূরজাহান' ও 'সাজাহানে' নাট্যকার সচেতনভাবে শেক্সপিয়রকে অনুসরণ করেছেন, নূরজাহান চরিত্রে লেডি-ম্যাকবেথ এবং সাজাহান চরিত্রে কিং-লিয়র চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে, জাহানারার চরিত্রেও কর্ডেলিয়ার ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়।

'মেবারপতন' নাটকটিতে আদর্শের রূপায়ণ ঘটাতে গিয়ে নাট্যকার ঘটনা-সংস্থান, চরিত্র সৃষ্টি ও রস-পরিণাম সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে এই নাটকে নরনারীর প্রেম, দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের ঋদ্ধ পরিচয় ফুটে উঠেছে ; বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বপ্রেমের আদর্শ সকলের উপরে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত হয়েছে। নাট্যকার দেশপ্রেমকে বিশ্বপ্রেমে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন—এখানেই নাটকটির বিশেষত্ব। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকসমূহে দেশাত্মবোধক গানের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। গানগুলি স্বদেশচেতনা-জাগরণকারী এবং এগুলি নাটকে সুপ্রযুক্ত হয়েছে। সর্বশেষ নাটক 'সিংহল বিজয়' সর্বাপেক্ষা দুর্বল রচনা। এ-তে কিংবদন্তির উপর নির্ভর করে নাট্যকার নাট্যকাহিনী গ্রন্থন করেছেন। চরিত্রচিত্রণ কিংবা ঘটনাগ্রন্থন নৈরাশ্যজনক। কাব্যগুণ ও নাট্যগুণে বিমিশ্রিত নাট্য-সংলাপ-সৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলালের সাফল্যের নজির হিসাবে 'সাজাহান' নাটক থেকে সাজাহানের এই সংলাপাংশ উদ্ধৃত হচ্ছে :

> 'উত্তম! তবে তাই হোক। আয় মা, তুইও আমার সহায় হ। আমি অগ্নির মত জ্বলে উঠি, তুই বায়ুর মত ধেয়ে আয়। আমি ভূমিকম্পের মত সাম্রাজ্যখানি ভেঙে চুরে দিয়ে যাই, তুই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মত তাকে এসে গ্রাস কর। আমি যুদ্ধ নিয়ে আসি, তুই মড়ক নিয়ে আয়। আয় ত ; একবার সাম্রাজ্য তোলপাড় করে দিয়ে চলে যাই—তারপর কোথায় যাই?—কিছুই যায় আসে না। খধূপের মত একটা বিরাট জ্বালায় জ্বলে উঠে—বিরাট হাহকারে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ি।'
>
> (২য় অঙ্ক / ২য় দৃশ্য)

বাংলা নাটকের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁর নিম্নলিখিত অবদানগুলি স্মরণযোগ্য—

১. তিনি মনোমোহন বসু প্রমুখ বা গিরিশচন্দ্রের প্রভাবিত নাট্যশৈলী ও নাট্যাঙ্গিকের অনুবর্তন না-করে পুরোপুরি ইংরেজি—নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, শেক্সপীরিয় রীতি অনুসরণ বা প্রয়োগ করেন।

২. তিনি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে অভিনয় বা পরিচালনাসূত্রে সংযুক্ত না-থাকায় দর্শকের মনোরঞ্জন বা ব্যবসায়িক সাফল্য ইত্যাদি নিয়ে মাথা না-ঘামিয়ে স্বাধীনভাবে নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলেন, ফলে নাটকের সামগ্রিক মানোন্নয়নে সক্ষম হয়েছিলেন।

৩. বাংলা নাটকে ভক্তিরস-অলৌকিকতার ধারাটি তাঁর হাতেই রুদ্ধ হয়ে যায় ; পরিবর্তে হিষয়বস্তু হিশাবে ইতিহাস ও জাতীয়তাবাদ স্থান করে নেয়।

৪. বাংলা নাটকে বিশ শতকসুলভ আধুনিকতার সূত্রপাত হয় তাঁর সময় থেকে।

৫. সঙ্গীতের সুপ্রয়োগ করে তিনি নাটককে অন্য মাত্রা দিয়েছেন।

৬. নাটকের চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বিরুদ্ধ ভাব-সংঘাত সৃষ্টি করে নাটকীয় গতিবৃদ্ধি এবং অন্যদিকে চরিত্রগুলি প্রাণময় ও বেগবান করে তুলেছেন।

৭. নাটকে এমন আশ্চর্য এক নাট্যভাষা নাট্যচরিত্রের সংলাপে ব্যবহার করেছেন যা

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে অভিনব। এ-ভাষা কাব্যময়তা-ওজঃগুণ-ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ ও অলঙ্কৃত বলে ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে এর ব্যবহার ঐশ্বর্যের হেতু হয়ে উঠেছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৪-১৯২৭) রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন, অথচ বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগ ছিল। তিনি অনেকগুলি নাটক রচনা করে বাংলা নাট্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। পেশাদার রঙ্গমঞ্চের নাট্যকাররূপে প্রভূত জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিলেন। তিনি প্রধানত গিরিশচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রথমশ্রেণীর নাট্যকারের প্রভাবও এড়াতে পারেন নি। তবে গিরিশচন্দ্রের আবেগ-তারল্য এবং দ্বিজেন্দ্রলালের কবিত্বধর্ম দু'য়েরই অভাব লক্ষ্য করা যাবে তাঁর নাটকগুলিতে। দর্শকের মনোরঞ্জনের পেশাদারি মনোভাব তাঁর নাটকে স্পষ্টত ধরা পড়ে। নিজে উচ্চশিক্ষিত হয়েও ইউরোপীয় নাট্যকলা সম্পর্কে তাঁর বিস্তৃত অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান ছিল না। আবার, তিনি পুরনো নাট্যধারার পুরোপুরি অনুবর্তনও করেননি ; দুই ধারার মধ্যবর্তী একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেছেন। যদি বলা যায়, উচ্চশ্রেণীর নাট্যকারের প্রতিভা তাঁর ছিল না, তাহলে অন্যায় হবে না। তবে জনপ্রিয়তার নিরিখে তাঁকে শক্তিমান নাট্যকার বলে স্বীকার করতেই হবে। দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শবাদ তাঁকে উদ্বেল করেনি, যদিও গিরিশচন্দ্রের পুরাণ-প্রীতি ও ভক্তিরস তাঁকে আবিষ্ট করেছিল। যুগের রুচি তাঁকে প্রভাবিত করেছে কিন্তু তিনি যুগরুচিকে প্রভাবিত করতে পারেন নি। ছোট-বড় সব মিলিয়ে তিনি চল্লিশখানি নাটক লিখেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, তিনি সামাজিক নাটক বা প্রহসন একখানিও লেখেননি। সমসাময়িক জীবন বা সমাজ-বাস্তবতা কিংবা সমাজ-সমস্যা তাঁর চেতনাকে আক্ষিপ্ত করতে পারেননি—এ থেকে তা-ই অনুমান করা যায়। তিনি অনেক পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন ; রঙ্গনাট্য, গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্য জাতীয় রচনাও তাঁর রচনাবলির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রঙ্গালয়প্রেমিক জনসাধারণের মনোরঞ্জন যদি নাট্য-বিচারের অন্যতম মাপকাঠি হয়, তবে ক্ষীরোদপ্রসাদকে একজন প্রধান নাট্যকার হিশাবেই মেনে নিতে হবে। তবে নাট্য-প্রতিভার বিচারে তিনি গিরিশ, দ্বিজেন্দ্রলাল বা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক পংক্তিভূত হওয়ার যোগ্য নন, তা স্বীকার করতে বাধা নেই।

ক্ষীরোদপ্রসাদের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল : পৌরাণিক নাটক—*'বভ্রুবাহন'* (১৮৯৯), *'সাবিত্রী'* (১৯০২), *'উলূপী'* (১৯০৬), *'ভীষ্ম'* (১৯১৩), ও *'নরনারায়ণ'* (১৯২৬) ; ঐতিহাসিক নাটক—*'পদ্মিনী'* (১৯০৭) ,*'চাঁদবিবি'* (১৯০৭), *'নন্দকুমার'* (১৩১৪ বঙ্গাব্দ), *'প্রতাপআদিত্য'* (১৯০৩), *'আলমগীর'* (১৯২১) প্রভৃতি ; *কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য* বা *গীতিনাট্য*—*'ফুলশয্যা'* (১৮৯৪), *'আলিবাবা'* (১৮৯৭), *'কিন্নরী'* (১৯২৬), *'খাঁজাহান'* (১৩১৯ বঙ্গাব্দ), *'রঘুবীর'* (১৩১০ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি। পৌরাণিক নাটকগুলির উৎস মহাভারত। উলূপীর পরিকল্পনায় নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্রের কিছু প্রভাব আছে। 'উলূপী ও

সাবিত্রী একটানা গদ্যে লেখা। 'ভীষ্ম' অংশত গদ্যে এবং অংশত ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরে লে
পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে *'নরনারায়ণ'* শ্রেষ্ঠ। দৈবনিগৃহীত পুরুষের লাঞ্ছন
নিয়তিশক্তির কাছে চরম পরাভব, দৈব ও পুরুষকারের দ্বন্দ্ব—এ-নাটকে দেখানো হ
মহাভারতীয় বীর কর্ণের দৈববিড়ম্বিত জীবনের আন্তরিক ও মর্মস্পর্শী কাহিনী ট্রা
আধারে নাট্যায়িত হয়েছে, তবে নাট্যকারের ভক্তিনিষ্ঠার জন্য নাটকের অবধারিত প
ঘটতে পারেনি, ফলে ট্রাজেডি ব্যাহত হয়েছে। "নরনারায়ণে'র কর্ণের অন্তর্দ্বন্দ্বটি চম
ফুটেছে, অবশ্য তার পিছনে রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তী-সংবাদে'র ছায়া দেখা যাচ্ছে।'২৯
নাটকটিও, যাত্রাধর্মী হলেও, নাট্যকারের শক্তির পরিচায়ক—অম্বার প্রতিহিংসাময়ী
স্বরূপের প্রসঙ্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটকে নাট্যকারের ক্ষ
পরিচয় পাওয়া যায়। 'প্রতাপ-আদিত্য ঘটনাবাহুল্যে নাট্যশৃঙ্খলে গ্রথিত হইতে পারে
ভূমিকায়ও পারিণতির এবং পূর্ণতার অভাব আছে। চাঁদবিবিতে রোমান্টিক
বাড়াবাড়ি।...আলমগীর ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে প
ঘটনার ভিড় এবং ভূমিকার বাহুল্য না থাকিলে ভালো হইত। ঔরঙ্গজেবের দ্বৈধ ব্যক্তিত্ব
ফুটে নাই। উদিপুরীর চরিত্রের বিভিন্ন দিকও পরিস্ফুট হইয়াছে। মোগল-অন্তঃপু
আলেখ্যে সম্ভাব্যতার অভাব আছে। সংলাপে (বিশেষতঃ নারী ভূমিকায়) কাব্যের ভাষা
নাই।'৩০

নাট্যকারের রঙ্গনাট্য ও গীতিনাট্যের মধ্যে *'ফুলশয্যা'* (১৮৯৯), *'আলিবাবা'*, *'জু*
(১৮৯৯), *'বেদৌরা'* (১৯০২), *'বাসন্তী'* (১৯০৮), *'কিন্নরী'* বেশ মঞ্চসফল হয়েছি
'রঘুবীর', *'খাঁজাহান'* আধা-ঐতিহাসিক, নাট্যগুণবিবর্জিত। *'রঘুবীর'* গদ্যে-পদ্যে লেখা। ত
হালকা চালের কাল্পনিক নাটকে,—যেমন, 'আলিবাবা'য় নাট্যকার বিশেষ কৃতিত্ব প্রদ
করেছেন। 'আলিবাবা'র মধ্যে ভাবগভীরতা নেই, চরিত্র-বিশ্লেষণেরও চেষ্টা নেই, সঙ্গীতব
লঘুচপল কৌতুকরসাশ্রিত নাটকটি প্রাণময়তা ও গতি-চঞ্চলতার জন্য বেশ উপভো
হয়েছে। এটি অত্যন্ত মঞ্চসফল হয়েছিল। *'কিন্নরী'*ও অতি-রোমান্টিক তরল কল্পনার ফস
হলেও উপভোগ্যতায় অ-তুলনীয়।

ড. সুকুমার সেন সাধারণভাবে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

> 'ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যরচনার প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে কাহিনীর মনোহারিত্ব অর্থা
> প্লটের গল্পরস। গিরিশচন্দ্র যে ভক্তিরসোচ্ছ্বাসের বন্যা আনিয়াছিলেন ক্ষীরোদপ্রসা
> তাহা প্রতিরোধ করিলেন নাট্যকাহিনীকে সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জক করিয়া।'৩১

বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত নাটক রচনা করেছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ। নাট্যচিন্তা
সে-সময়ে যে প্রগতি-চিন্তা এসেছিল—বিষয় ও নাট্য-আঙ্গিকে, তার অল্পই তিনি আত্মসা
করতে চেয়েছিলেন বলে জনপ্রিয় নাট্যকার হিশাবে সমকালে সাফল্যলাভ করলেও
পরবর্তীকালে ও আধুনিককালে নাট্যক্ষেত্রে তাঁর অবদান খুবই অকিঞ্চিৎকর বলে গণ্য হতে
পারে।